ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য : সাফল্য ও সীমাবদ্ধতা

গোপা দত্তভৌমিক

১

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৪৭ আর প্রয়াণ ১৯১৯। তাঁর জন্মের পর একশো পঁচাত্তর বছর ও মৃত্যুর পর একশো বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। বাঙালি পাঠক তাঁকে মূলত 'কঙ্কাবতী' ও 'ডমরুচরিত'-এর লেখক হিসেবেই চেনে। তাঁর অন্য রচনাগুলি কিঞ্চিৎ চাপা পড়া। প্রতিভার তুলনায় তিনি নিঃসন্দেহে কম সমাদর পেয়েছেন। তাঁর লেখার অসাধারণ মৌলিকতা সমকালে তো বটেই, পরেও কম সমাদৃত হয়েছে। অথচ তাঁর প্রভাব বাংলা সাহিত্যে অল্প নয়।

শ্যামনগরের কাছে রাহুতা গ্রামে ছিল তাঁদের নিবাস। ১৮৬২ সাল নাগাদ ওই অঞ্চলে প্রবল ম্যালেরিয়া দেখা দেয়। ত্রৈলোক্যনাথের ঠাকুরমা, বাবা, মা অল্প দিনের ব্যবধানে পরলোকগমন করেন। তিনি নিজেও ভুগেছিলেন। আজ আমরা অনেকেই জানি রেললাইন বসানোর জন্য জল জমে ম্যালেরিয়ার মশার বংশবৃদ্ধি হয়ে সেকালে তা মহামারী রূপে দেখা দেয়। ১৮৬৪ সালের ঝড়ে মুখোপাধ্যায় পরিবারের বাগান-বাগিচা নষ্ট হয়। অভাবে সংসার প্রায় অচল হয়ে পড়ে। ১৮৬৫ সালে কিশোর ত্রৈলোক্যনাথ বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হন। বাল্যকাল থেকে খুব মেধাবী ছিলেন কিন্তু নিশ্চিন্তে পড়াশোনার সুযোগ পাননি। সে যুগের হিসেবে স্কুলে থার্ডক্লাস, মানে আজকের ক্লাস এইট পর্যন্ত তাঁর টানা প্রথাগত পড়াশোনা। তারপর নিজের চেষ্টায় তিনি সুশিক্ষিত হন। বাড়ি থেকে পালানোর পর যেসব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছে তা যেমন বিপদজনক তেমনি রোমাঞ্চকর। রানিগঞ্জে দামোদর পার হবার সময় তিনি হিন্দুস্থানি এক আড়কাঠির খপ্পরে পড়ে আসামের চা-বাগানে চালান হয়ে যাচ্ছিলেন। এরপর বিভিন্ন আত্মীয়বাড়িতে মাঝে মাঝে আশ্রয় পেয়েছেন, স্কুলে পড়ার সুযোগও জুটেছে কিন্তু ধারাবাহিক নয়। হাতিধরা দলের সঙ্গে জুটেছেন, বনজঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছেন, মৌলবীর কাছে ফারসি পড়েছেন। লিখেছেন, 'অল্পদিনে পদনামা, আমোদনামা, গোলেস্তা, বোস্তা শেষ করিলাম।' এই পাঠের প্রভাব তাঁর সাহিত্যে গভীর ভাবে পড়েছিল। উনিশ শতকের ষাটের দশকের মাঝামাঝি পূর্বভারতে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। 'চারিদিকে ঘোর অন্নকষ্ট। সুতরাং কোনদিন আহার মিলিত, কোনদিন মিলিত না।' সেই সময়ই দেশের অন্নভাব দূর করার সংকল্প নিয়েছিলেন, পরে এই ব্যাপারে কার্যকরী উদ্যোগ নেন।

মাঝে মাঝে স্কুলে পড়ানোর চাকরি জুটত। প্রথমে বেতন ছিল আঠারো টাকা। পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

তাঁকে সাজাদপুরের জমিদারিতে স্কুল শিক্ষকের চাকরি দেন, বেতন পঁচিশ টাকা। সেখানে বর্ষাকালে নৌকো করে যেতে যেতে একটি মর্মান্তিক দৃশ্য দেখেন। 'একটা সামান্য মাটির ঢিপি জলের মধ্যে দ্বীপের ন্যায়; ইহার কেবলমাত্র মাথাটি জাগিয়াছিল, — সেই স্থানে তিনটি অশীতিপর বৃদ্ধা বসিয়া আছে। তাহাদের চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, — কিছুই নাই। কথা জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তর দিতে পারেনা — কেবল ঘাড় কাঁপাইতে থাকে, ...কোন নৃশংস লোকেরা সেই অনাথিনীদিগকে ফেলিয়া গিয়াছে।'

ত্রৈলোক্যনাথ এদের রক্ষা করবার জন্য তুলে এনে সাজাদপুরের নায়েবের বিরক্তিভাজন হন। অসমর্থ বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের সঙ্গে অমানবিক ব্যবহারের ইতিহাস বোঝা যায় অনেক পুরনো। ভবঘুরে জীবনে মানুষের স্বভাবের দানবত্ব, দেবত্ব দুটির সঙ্গেই ত্রৈলোক্যনাথের পরিচয় ঘটেছে, তাঁর সাহিত্যে সেই সব অভিজ্ঞতা তির্যক ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। শিক্ষকতার পর পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টরের চাকরি জুটল। তাঁর পুলিশে চাকরির সময় কেওনঝড়ের লড়াই হয়। এই যুদ্ধ রাজ্যের সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে মৃত রাজার দত্তকপুত্র ধনঞ্জয় ভঞ্জদেও ও তাঁর পক্ষে ব্রিটিশ সরকার এবং অন্যদিকে নিঃসন্তান পূর্ব রানি ও তাঁর অনুগত আদিবাসী প্রজাদের মধ্যে ঘটেছিল। ত্রৈলোক্যনাথ লিখেছেন, 'ভুঁইয়া, জোয়ান, কোল প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা পরাস্ত হইল। বিচারে কাহারও ফাঁসী হইল, কাহারও বা দীপান্তর হইল।' বোঝা যায় আদিবাসীদের সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার বাইরে তিনি যেতে পারেননি। তখনকার শিক্ষিত বাঙালিরা বেশিরভাগ এদের অসভ্যই ভাবতেন। ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিলেন — ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

দারোগা পদে উন্নীত হয়ে উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থানে পোস্টেড হয়েছেন ত্রৈলোক্যনাথ। ওড়িয়া ভাষা শিখেছেন, ওই ভাষার বইপত্র পড়েছেন। 'উৎকল শুভঙ্করী' নামে মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। এই ব্যাপারে সেকালে শিক্ষিত বাঙালির অন্য প্রদেশের মানুষের ভাষা, সংস্কৃতি বিষয়ে অবজ্ঞা ও নাসিকাকুঞ্চনের সংকীর্ণতা তাঁকে পেয়ে বসেনি।

> 'আমাদের যেমন কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র, কাশীদাসী মহাভারত আছে, উড়িয়া ভাষায়ও এ শ্রেণীর অনেক অধিক ও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে। কেবল ভাষায় নহে, উড়িয়াবাসীর প্রতাপও দোর্দণ্ড ছিল। ইহাদের পরাক্রমে কতবার, একদিকে তৈলঙ্গ অপরদিকে বঙ্গদেশের মুসলমান রাজগণকে পরাস্ত হইতে হয়। দুই দিক হইতে এরূপ আক্রান্ত হইয়াও উৎকলবাসীরা সাড়ে তিনশো বৎসর পর্যন্ত আপনাদিগের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। যাঁহারা উড়িয়াদিগকে এক্ষণে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন, তাঁহারা নিতান্তই ভ্রান্ত। কনারক, জগন্নাথ, ভুবনেশ্বর মন্দির, কাঠজুলির বাঁধ প্রভৃতি ইহাদের কীর্তি আজও দেদীপ্যমান।'

তবু যে কেন ওড়িয়া ভাষা তুলে বাংলা প্রচলন করার বিফল চেষ্টা করেছিলেন বোঝা মুশকিল। তাঁর মনে হয়ত দেশের ঐক্যসাধনের ইচ্ছাই প্রধান ছিল। তার জন্য বাংলা তুলে হিন্দি প্রচলনেও তাঁর আপত্তি ছিল না। কিঞ্চিৎ একগুঁয়ে মেজাজের ছিলেন কোনও সন্দেহ নেই। কটকে থাকার সময় ডব্লু. ডব্লু. হান্টারের সঙ্গে তাঁর আলাপ — পরে যা ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। হান্টারের অধীনে কাজ করার স্মৃতি তাঁর পক্ষে সুখাবহ। পরের দেশের উত্তর-পশ্চিমে কৃষি-বাণিজ্য অফিসে চাকরি নেন, কর্তা এডওয়ার্ড বক। দরিদ্র দেশবাসীর জন্য কাজ করবেন এই উদ্দেশ্যেই ত্রৈলোক্যনাথ এই কাজ নেন। বক সাহেবের অধীনে কাজের অভিজ্ঞতাও ভাল হয়েছিল। 'সৌভাগ্যক্রমে আমি যে দুই তিন ইংরেজের কাছে কাজ করিয়াছি তাঁহারা সকলেই উদার চরিত্র।'

এই সময়ে ত্রৈলোক্যনাথের একটি বড় উদ্যোগ ভারতের ঐতিহ্যমণ্ডিত কুটিরশিল্প সমূহের পুনরুদ্ধার এবং এইসব সামগ্রী যথাযোগ্য ভাবে বিক্রির ব্যবস্থা করা। 'উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বহুকাল হইতে নানারূপ কারুকার্য গঠিত হইত। যথা কাশীর রেশমের কাপড়, গোটা, পিতলের কাজ ইত্যাদি; লক্ষ্ণৌয়ের — গোটা,

চিকণ, সূচের কর্ম, সোনা রূপার কাজ, বিদরীর কাজ; মুরাদাবাদের পিতলের উপর মিয়া কলম; নগীনার কাঠের কাজ ইত্যাদি। হিন্দু রাজাদের সময়ে এবং মুসলমানদের আমলে বাদশাহ, নবাব, আমীর, ওমরাহ এই সকল দ্রব্যের আদর করিতেন। ইংরেজের অধিকারে এই সকল শিল্প কারুকার্য লোপ পাইতে বসিয়াছিল।'

খরিদ্দারের অভাবে কারিগররা প্রচণ্ড দারিদ্র্যভোগ করছিল। অনেকে বংশগত শিল্পকাজের পেশা ছেড়ে চাষবাসে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছিল। উপায়ান্তর না দেখে ভিক্ষার পথ নিতে হচ্ছিল তাদের — এমন উদাহরণও ছিল। ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর উপরওয়ালা সাহেবদের বলে এইসব শিল্পদ্রব্য কিনে হোটেলে বা রেলস্টেশনে সাজিয়ে রেখে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। সাধারণ ভাবে ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে এবং বিলিতি, সুলভ, যন্ত্র-উৎপন্ন দ্রব্যাদি ব্যাপকভাবে আমদানির জন্যই ভারতের কুটিরশিল্পসমূহ বিলুপ্তির মুখে গিয়েছিল এটা যেমন সত্য, ব্রিটিশ শাসকদের মধ্যে অনেকে এই সমৃদ্ধ শিল্প ঐতিহ্যের অনুরাগীও ছিলেন। আজ কটেজ ইণ্ডাস্ট্রিজ বা খাদি গ্রামোদ্যোগের মতো প্রতিষ্ঠানগুলি যে কাজ করছে তার সূচনা ত্রৈলোক্যনাথের হাতেই হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে এইসব কাজের প্রদর্শনীর সূত্রে ইয়োরোপে পাঠিয়েছিল। রক্ষণশীল পরিবারবর্গের বাধাদান সত্ত্বেও তিনি ইয়োরোপে যান। সঙ্গে অবশ্য পাচক ব্রাহ্মণ ছিল। বিদেশে আহারাদি বিষয়ে যতটা সম্ভব দেশাচার রক্ষা করে চললেও ফিরে আসার পর শাস্ত্রবিধি অনুসারে প্রায়শ্চিত্তের হাত থেকে রেহাই পাননি। তাঁর লেখায় অর্থহীন শাস্ত্রাচার এবং ধর্মধ্বজীদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও ক্রোধ বারবার বর্ষিত হয়েছে।

ত্রৈলোক্যনাথের একমাত্র পুত্র সুধীরকুমার মুখোপাধ্যায় 'পিতৃস্মৃতি' নামে তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধটিতে পিতা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অনেক কথা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। যেহেতু তাঁর লেখায় ভূতপ্রেতের আনাগোনা রয়েছে তাই অপ্রাকৃত জগৎ সম্পর্কে তাঁর কী ধারণা ছিল জানার কৌতূহল থাকে পাঠকের। সুধীরকুমার জানাচ্ছেন, দেওঘরে গিয়ে তপোবন পাহাড়ে তাঁর পিতা গুরুর কাছে দীক্ষা নেন। এর পর থেকে তন্ত্র সম্পর্কে তিনি আগ্রহী হয়ে পড়েন।

'মহানির্বাণতন্ত্র নামে একখানি বই খুব মন দিয়া পড়িতেন। ভূত-প্রেত সম্পর্কে তাঁহার বিশ্বাস ছিল না, তিনি বলিতেন লোকে ভয় পাইয়াই ভূত প্রেত দেখে।...তবে ভূত প্রেতে তাঁহার বিশ্বাস না থাকিলেও spirit বা আত্মায় তিনি বিশ্বাস করিতেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা ছিল, spirit আছে তবে উহা ঈশ্বরের মত অদৃশ্য। উহারা কাহারও ক্ষতি করে না। প্ল্যানচেটে medium-এর মাধ্যমে spirit-এর অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। বাবা অনেকবার আমাকে medium করিয়া রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও অন্যান্যদের আত্মার সহিত যোগাযোগ করিবার চেষ্টা করিতেন।'

তন্ত্র সম্পর্কে উল্লেখ তাঁর রচিত সাহিত্যে আমরা দেখব। spirit-এ বিশ্বাস ও প্ল্যানচেটে পরলোকের সঙ্গে যোগ স্থাপনে সে যুগের শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে অনেকেই রীতিমতো উৎসুক ছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্র, শিশিরকুমার ঘোষ প্রমুখের কথা মনে পড়বে। এমনকি রবীন্দ্রনাথও এক সময়ে এই চেষ্টা করেছেন। ত্রৈলোক্যনাথ ব্যতিক্রম নন।

কোন ধরনের বই ও পত্রপত্রিকা ত্রৈলোক্যনাথের প্রিয় ছিল সে বিষয়েও সুধীরকুমার জানিয়েছেন।

> 'উনি Englishman ও বঙ্গবাসী খবরের কাগজ, অনেক রকম দেশি-বিদেশি পত্রিকা যথা Strand, Windsor, Novel, Wide-world, Pearson, Royal National Titbits, Mr Stead সম্পাদিত Scientific American ইত্যাদি বই পড়িতেন। বিদেশি লেখকদের মধ্যে W. W. Jacobs, P. G. Wodehouse, Lewis Carroll, Arthur Conan Doyle, Mark Twain, Charles Dickens-এর রচনা তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। বিদেশি পত্রিকায়

> যেসব কৌতুককর কাহিনি প্রকাশিত হইত সেগুলি তিনি খুব মনোযোগ দিয়া পড়িতেন এবং আমাকে পড়িতে দিতেন।'

দেখা যাচ্ছে সামাজিক ছবি, রহস্য গল্প, গোয়েন্দা গল্প, অপ্রাকৃতের আবেশ, উদ্ভট রসের লেখা, সর্বোপরি কৌতুকরসদীপ্ত রচনা তাঁর বিশেষ পছন্দ ছিল। লুইস ক্যারলের ননসেন্স যে তাঁকে প্রভাবিত করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। ভিক্টোরীয় ননসেন্স কবিতার আরেক দিকপাল এডওয়ার্ড লিয়রের রচনাও হয়ত তিনি পড়েছিলেন। ভাবতে ভাল লাগে চার্লস ডিকেন্সের 'ক্রিসমাস ক্যারল' হয়ত তাঁর প্রিয় রচনা ছিল। সেখানেও নানা ভূতের আনাগোনা রয়েছে। ত্রৈলোক্যনাথের লেখায় সমাজবাস্তবতা খুবই প্রখর — কিন্তু তা আজগুবি বা ভুতুড়ে মুখোশ পরে সাজবদল করে মঞ্চে হাজির হয়েছে। তাই সে যুগের তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের থেকে তাঁর সাহিত্যে বাস্তবতার সুর আলাদা। স্যাটায়ার ও হিউমারের সঙ্গে grotesque এবং bizzare মিলে ত্রৈলোক্যনাথের কথাসাহিত্যে একটি বিরল জগত সৃষ্টি করেছে। দেশি রূপকথা এবং আরব্য উপন্যাসের কল্পজগতের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকলেও পাঠক অনুভব করে রূপকথার আড়ালে আধুনিক ভঙ্গিতে লেখক রূঢ় নিষ্ঠুর বাস্তবকে ফুটিয়ে তুলছেন। তাঁর আগে ঠিক এই ধরনের লেখা বাংলা সাহিত্যে দেখা যায়নি। যদিও উদ্ভটরস সৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্রের দক্ষতা প্রশ্নাতীত, আমাদের মনে পড়বে 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ কৃষ্ণকান্তের আগডুম বাগডুম স্বপ্ন, আফিমের ঝোঁকে কমলাকান্তের দিব্যদৃষ্টিলাভ এবং 'সুবর্ণ গোলক'-এর মতো রচনা। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের বিশিষ্টতা এই ব্যাপারে পদ্ধতিগত ভাবেই আলাদা। উত্তরসূরীদের মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথের উত্তরাধিকার অনুভব করা যায় পরশুরাম ও সুকুমার রায়ের মধ্যে। কথাবস্তু নির্বাচনে ত্রৈলোক্যনাথ অনেক ক্ষেত্রেই পরশুরামের পথিকৃৎ, মিল আছে স্যাটায়ার ও উদ্ভট রসের দিকে ঝোঁকের ব্যাপারেও। বিশেষভাবে বৈঠকী রীতির গল্পের ক্ষেত্রে অবশ্য তাঁর উত্তরাধিকার প্রমথ চৌধুরী, পরশুরাম পেরিয়ে সম্বুদ্ধ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সত্যজিৎ রায় পর্যন্ত প্রসারিত।

২

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমূহের মধ্যে রয়েছে 'কঙ্কাবতী', 'ফোকলা দিগম্বর', 'ময়না কোথায়', 'পাপের পরিণাম', গল্পগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'ভূত ও মানুষ', 'মুক্তামালা', 'মজার গল্প', 'ডমরু-চরিত', — এছাড়া রয়েছে 'রূপসী হিরন্ময়ী', 'আমার সেই অমূল্যমণি'। তাঁর গল্পের নির্মাণে আধুনিক ছোটগল্পের শিল্পরূপ খুঁজে লাভ নেই। রবীন্দ্রনাথের হাতে জন্মলাভ করে বাংলা ছোটগল্প অসামান্য ঐশ্বর্যলাভ করেছে। সেই বিন্দুতে সিন্ধুদর্শন কিংবা জীবনের খণ্ডাংশকে সাংকেতিক সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত করে তোলার কৌশল তাঁর নয়। বরং প্রাচ্য পৃথিবীর যে প্রাচীন গল্পকলা ভারতের জাতক, কথাসরিৎসাগর, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, দশকুমারচরিত, শুকসপ্ততি, বেতাল পঞ্চবিংশতি, বত্রিশ সিংহাসন এবং মধ্যপ্রাচ্যের আরব্য উপন্যাস, পারস্য উপন্যাস, এক কথায় আরবি, ফার্সি সাহিত্যের মধ্যযুগের স্বর্ণভাণ্ডারে ষড়ৈশ্বর্য প্রকাশ করেছে, — যে গল্প বলার কৌশল সাগ্রহে তুলে নিয়েছে প্রতীচ্য পৃথিবী ঈশপস্ ফেবলস্, দেকামেরন কিংবা র‍্যাবলার গারগাতুয়া পেঁতাগ্রুয়েল, চসারের ক্যান্টারবেরি টেলস, সেই গল্পের মধ্যে গল্প বুনে চলার রীতিটাই তাঁকে টেনেছিল। রাশিয়ার 'মাত্রুশকা' পুতুলের মত একটি বড় পুতুলের পেটে মেজ, সেজ, ন, ছোট পুতুলের লুকিয়ে থাকার শৈলী এই গল্পধারার। বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্সধর্মিতা তাঁর নয়। তাঁর রোমান্স প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় গল্পধারার সঙ্গেই মেলে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের থেকে শুরু করে বিদ্যাসাগর পর্যন্ত বহু লেখক সংস্কৃত, হিন্দি, আরবি, ফার্সি রোমান্সধর্মী গল্প অনুবাদ করেছেন। ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পুরনো ধারার গল্পগুলি গ্রন্থাকারে ঘরে

ঘরে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিশেষ করে আরবি ও ফার্সি 'কিস্‌সা' বা কাহিনীর অনুবাদ বাঙালির গল্পরসপিপাসাকে বহুদিন ধরে তৃপ্ত করেছিল। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র 'বিজয়বসন্ত' বা 'গোলেবকাওলি'র যুগ অতিক্রম করিয়ে বাঙালি পাঠককে নতুন অভিজ্ঞতার মধ্যে এনেছিলেন। এই দুটি নাম গল্পধারার প্রাচীন রীতির ঐতিহ্যবাহী — কী বিপুল জনপ্রিয়তা ছিল এই ধারার তা রবীন্দ্র-মন্তব্য থেকে বোঝা যায়। ত্রৈলোক্যনাথ কলম ধরার সময় গল্প পরিবেশনের চিরচেনা এই পদ্ধতিটি বাইরের সংরূপের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছিলেন। এক কথায় আধুনিক সমাজচেতনাকে প্রাচীন আধারে স্থাপিত করেছিলেন।

বাংলার রূপকথার ঐতিহ্যটিও তাঁকে আকর্ষণ করেছিল। রূপকথা ও উপকথা মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে 'ফোক টেলস্ অফ বেঙ্গল' (১৮৭৫) গ্রন্থে প্রথম লোককথাগুলিকে সংকলন করেন। পরবর্তীকালে দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার এবং উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী রূপকথা ও লোককথা সংকলনে হাত দেন। এই ঐতিহাসিক কাজগুলি যখন হচ্ছে তখন ত্রৈলোক্যনাথ কর্মজীবনের মধ্যগগনে। তিনি সংকলন করেননি তবে রূপকথা বা লোককথা বলার শৈলীটিকে, ফ্যান্টাসি ও অ্যাবসার্ডিটিকে তাঁর বক্তব্যের আধার হিসেবে কাজে লাগিয়েছেন। আপাতদৃষ্টিতে খুবই সাদাসিধে বর্ণনারীতি কিন্তু লুকোনো ব্যঙ্গের ছুরিটি তীক্ষ্ণ আঘাতে অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ করেছে। বৈপরীত্যের এই দ্বান্দ্বিকতা ত্রৈলোক্য-শৈলীর বিশেষ মুদ্রাচিহ্ন। উদাহরণ হিসেবে 'মুক্তামালা'-তে সুবল গড়গড়ির সঙ্গে জলের কলসরূপী সনাতন নস্করের কথাবার্তা একটু লক্ষ্য করা যাক।

> 'স্বর উত্তর করিল, — "আমি এই জলের কলস। এ জন্মে আমি জলের কলস হইয়াছি।"
>
> আমি বলিলাম, — "আপনি জলের কলস হইয়াছেন! আপনি কে?"
>
> স্বর উত্তর করিল, — "আমি সনাতন নস্কর। আর জন্মে আমি তোমার প্রতিবেশী ছিলাম। আমাকে মনে নাই?"
>
> সত্য বটে, সনাতন নস্কর নামে আমাদের এক বৃদ্ধ প্রতিবেশী ছিলেন। তিনি অতি সজ্জন ছিলেন। তাঁহাকে আমরা বিশেষরূপে মান্য করিতাম। আশ্চর্য্য হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, — "আপনি নস্কর মহাশয়? এ জন্মে আপনি মেটে কলসি হইয়াছেন? মানুষ মরিয়া কলসী হয়?"
>
> কলসী উত্তর করিলেন — "মানুষ মরিয়া নানা রূপ হয়। সে রূপের সংখ্যা চৌরাশি হাজার।"
>
> আমি বলিলাম — "জীবিত অবস্থায় আপনি একজন সাধু পুরুষ ছিলেন, তবে কেন আপনাকে সামান্য একটি মেটে কলস হইতে হইয়াছে?"
>
> নস্কর মহাশয় অর্থাৎ কলসী উত্তর করিলেন, — "আমি তো তবু অনেক ভালো দ্রব্য হইয়াছি। জগবন্ধুকে জান? জগবন্ধুর মা মরিয়া সামান্য একখানি খুরি হইয়াছে।"
>
> আমি বলিলাম, — "আমি শুনিয়াছি যে, জীবাত্মার ক্রমে ক্রমে উন্নতি হয়। কুম্ভকারের দ্রব্যে পরিণত হইলে জীবাত্মার উন্নতি কিরূপে হয়?"
>
> নস্কর মহাশয় উত্তর করিলেন, — "জগবন্ধুর মা এখন খুরি হইয়া আছেন। আর জন্মে তিনি হয়তো একখানি সরা হইবেন। আর তার পরজন্মে হয়তো তিনি মালশী হইবেন। তারপর হয়তো তিনি একখানি তিজেল হইবেন, তারপর তোলো হাঁড়ি — এইরূপে ক্রমে ক্রমে তিনি উন্নতিলাভ করিবেন। আমি এখন কলস আছি। আর জন্মে আমি হয়তো পূজার ঘট হইব। তাহার পর হয়তো পিতলের ঘড়া হইব।" '

এই আলাপ কর্মফল ও জন্মান্তরবাদের রকমারি তত্ত্বের প্রতি যেন এক বিশাল অট্টহাসি। অথচ

কথনের ভঙ্গিটি নেহাৎ নিরীহ, গ্রামীণ উপকথার সারল্যমাখা। ‘মুক্তামালা’ শুরু হচ্ছে সন্ধেবেলা মহাদেববাবুর মজলিশে। উপস্থিত আছেন যাদব, মাধব, রাঘব, ত্রিলোচন, গদাধর, ঘনশ্যাম প্রভৃতি বন্ধুরা। আড্ডার প্রধানের মহাদেব নাম সার্থক করে মজলিশে গাঁজার নেশা করতে করতে তাঁরা গল্প করেন। কী গল্প হবে তা নিয়ে মতভেদও হয়, ভূতের গল্প, সাপের গল্প, বাঘের গল্প, চোর-ডাকাতের গল্প, রাজা-রানির গল্প, যুদ্ধের গল্প কিছুই বাদ যায় না। এই বৈঠকী ভঙ্গি পরে প্রমথ চৌধুরীর ঘোষাল বা নীললোহিতের গল্পে, পরশুরামের চাটুজ্জেমশায়, জটাধর বকশীর গল্পে, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড়দার গল্পে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদা, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের টেনিদা এবং সত্যজিৎ রায়ের তারিণীখুড়োর গল্পে দেখতে পাব। বাঙালির আদি ও অকৃত্রিম চণ্ডীমণ্ডপীয় আড্ডা ক্রমে শহুরে বেশ ধারণ করে ধনীর বৈঠকখানা, মেসবাড়ি, পরে চায়ের দোকান, কফিহাউস আশ্রয় করেছে।

‘মুক্তামালা’র কাঠামো বেতাল পঞ্চবিংশতি বা বত্রিশ সিংহাসনের মতো। সুবল গড়গড়ির বয়ানে গল্পগুলি গাঁথা, বৈঠকে বক্তা অবশ্য ঘনশ্যামবাবু। তিনি গড়গড়ির কাছে তাঁর কিম্ভুত অভিজ্ঞতার কথা শুনেছেন। গড়গড়ির গুরুদেব একজন মহাশয় ব্যক্তি। তিনি পাঁঠার মাংসের কারবার করেন। পাঁঠার দাম বেশি বলে পাঁঠীই কাটেন।

> ‘আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, — ‘‘পাঁঠী! স্ত্রীপশু না খাইতে নাই?’’ গুরুদেব উত্তর করিলেন, — ‘‘আমি নিজে খাই না, আমি বিক্রয় করি। আমার শিষ্য যজমান আছে। মাছ-মাংস একেবারেই আমি খাই না। সকলেই জানে যে, গোলোক চক্রবর্তী নিষ্ঠাবান সদব্রাহ্মণ। লেখাপড়া জানিনা, নিজের নামটিও সই করতে পারিনা, ঢেরা দিয়া সারি। তবুও দেখ, এই নিষ্ঠার জন্য তোমার বাপ-মায়ের কল্যাণে সকলেই আমাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে।’’’

ঠাকুরমশাই জ্যান্ত অবস্থায় পাঁঠার ছাল ছাড়ান কারণ তাতে ‘‘ঘোর যাতনায়...ঘন ঘন কম্পনে ইহার চর্মে একপ্রকার সরু সরু সুন্দর রেখা অঙ্কিত হইয়া যায়। এরূপ চর্ম দুই আনা অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়।...ব্যবসা করিতে আসিয়াছি, বাবা! দয়া-মায়া করিতে গেলে আর ব্যবসা চলেনা।’’ এই নরাধম ব্রাহ্মণ মনে করিয়ে দেয় শরৎচন্দ্রের ‘বামুনের মেয়ে’ উপন্যাসের কুচক্রী গোলোক চাটুয্যেকে। সেই ব্যক্তিটিও ছাগল গরুর ব্যবসায়ের মহাজন ছিল। লক্ষণীয় দুজনেই গোলোক নামধারী ব্রাহ্মণ।

‘পুরাতন কূপ’ গল্পটিতে মহাবিদ্রোহের ছবি আছে। যদিও ত্রৈলোক্যেনাথের কাছে তা সিপাহীবিদ্রোহ মাত্র। তিনি নিজে মহাবিদ্রোহের সময় মাত্র দশ বৎসরের বালক — সুতরাং যা শুনেছেন এবং পড়েছেন তাই লিখেছেন। দেশে ব্যাপক অরাজকতা, গৃহদাহ, লুটপাট, মারপিট, চুরিডাকাতি, খুনখারাবি চলছিল। ‘বিদ্রোহিগণ ঘোর নিষ্ঠুরতা সহকারে সাহেবদিগকে বধ করিতে লাগিল। বাঙ্গালিরা ইংরেজের গুরু, এই বলিয়া বাবুদের প্রতিও অত্যাচার কম হইল না।’ বিদ্রোহশেষে দেশে শান্তি ফিরে আসার কথা আছে। কিন্তু ইংরেজরা যে শতগুণ হিংস্রভাবে বিদ্রোহ দমন করে রক্তবন্যা বইয়ে দিয়েছিল তা লেখক উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করেননি। এই বিষয়ে সেকালের শিক্ষিত বাঙালির ভাবনার বাইরে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

‘মূল্যবান তামাক ও জ্ঞানবান সর্প’ গল্পটি শুরু হচ্ছে ফরাসডাঙায় গুলির আড্ডার বর্ণনা দিয়ে। গুলি ও গাঁজাখোররা গল্পের গরুকে গাছে তুলেছে। তিনুবাবু তার দেশের আশ্চর্য সাপের কাহিনী ফেঁদেছেন । সেই সব সাপ রোজ এসে মুড়ি খেয়ে যায়, তাদের লেজ শিশুরা চুষিকাঠির মতো চোষে, গরুর গলার দড়ি হয়, মেয়ের মাথার চুলের ফিতের কাজ করে — এমনকি ত্রৈরাশিকের অংক কষে। গণিতজ্ঞ সাপটি যেন ‘হ য ব র ল’-এর কাক্কেশ্বর কুচকুচের পূর্বসূরী। ত্রৈরাশিক না ভগ্নাংশ তা নিয়ে কাক্কেশ্বর ভাবিত ছিল মনে পড়ে। তিনুবাবুর কথা কেউ অবিশ্বাস করেনি কারণ সবাই কল্কের সমঝদার। ‘কঙ্কাবতী’তেও

ত্রৈরাশিকের আঁক কষা ব্যাঙের কথা আছে।

‘ভূত ও মানুষ’ গল্পগ্রন্থে সব ক’টি গল্পেই ‘কিস্‌সার’ ছাঁচ আছে আর ফ্যান্টাসির আলোছায়ায় তীব্র হয়ে দেখা দিচ্ছে সামাজিক বিদ্রূপ। ‘বাঙাল নিধিরাম’ গল্পের উদ্ধবদাদা পাঁড় মাতাল, আবার টিকিটিও সযত্নে রক্ষা করেন। তাঁর যুক্তি পরিষ্কার, ‘বংশজ ব্রাহ্মণ, বিয়ে হয় নাই। কাওরাণীর ঘরে থাকি, দেখা-সাক্ষাৎ কাওরাণীর ভাত খাই। কেহ কিছু গোল তুলিলে অমনি টিকিটি খাড়া করিয়া ধরি। বলি, ‘এই দেখো বাবা টিকি আছে।’ নিধিরাম রামনগরে যে ব্রাহ্মণের বাড়ি অতিথি হয়েছিলেন, তার ‘বলিষ্ঠ সাত বেটা’ — সকলেই মকদ্দমা মামলা, দাঙ্গা হাঙ্গামা, চুরি ডাকাতি সকল বিষয়ে পরিপক্ক। বর্ণহিন্দুরা সকলেই যে নিতান্ত ভদ্রলোক — এই মিথ ত্রৈলোক্যনাথ বারবার ভেঙে দিয়েছেন। এই গ্রন্থে ‘লুল্লু’ গল্পটি রত্নবিশেষ। এখানেই সেই বিখ্যাত ভূত নির্মাণের অসাধারণ ফর্মুলা আছে।

> ‘যেমন জল জমিয়া বরফ হয়, অন্ধকার জমিয়া তেমনি ভূত হয়।...অন্ধকারের অভাব নাই। নিশাকালে বাহিরে তো অল্প স্বল্প অন্ধকার থাকেই। তারপর মানুষের মনের ভিতর যে কত অন্ধকার আছে, তাহার সীমা নাই, অন্ত নাই। কোদাল দিয়া কাটিয়া কাটিয়া ঝুড়ি পুরিয়া এই অন্ধকার কলে ফেলিলেই প্রচুর পরিমাণে ভূত প্রস্তুত হইতে পারিবে।’

এই গল্প ‘গুপী গাইন বাঘা বাইন’ এবং ‘ভূশণ্ডীর মাঠ’-এর পূর্বসূরী। ঘ্যাঁঘো ভূত তার বড় নাগরা জুতোজোড়ার যে চমৎকারিত্ব দেখিয়েছে তা অবিকল ভূতের রাজার দেওয়া জুতোর মতো। সে বেশ গর্বের সঙ্গে বলেছে, ‘সে জুতাটি পায়ে দিলে আমি বাতাসের উপর উত্তম চলিতে পারি। মুহূর্তের মধ্যে সমুদয় ভারতভূমি ভ্রমণ করিতে পারি।’ জুতোর জাদুশক্তি সে দেখিয়েও দিয়েছে। ফ্যান্টাসির মধ্যেই ঝলসে উঠেছে বাংলার গ্রামে বিয়ের সম্বন্ধে ভাংচি দেওয়ার কুশ্রী অভ্যাসের উপর ব্যঙ্গের চাবুক। ঘ্যাঁঘোর মনে বড় দুঃখ, প্রতিবেশী আর এক ভূত তার পরম শত্রু। ‘আমার যেখানে বিবাহের সম্বন্ধ হয়, সে গিয়া ভাংচী দিয়া আসে। প্রেতিনী, শঙ্খচূর্ণী, চুড়েল প্রভৃতি নানা প্রকার ভূতিনীদের সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল।...কিন্তু এই দুরাচার গিয়া কন্যার পিতামাতার কাছে আমার নানারূপ কুৎসা করে।...ভূতগিরি করিতে করিতে বুড়া হইয়া যাইলাম, আজ পর্য্যন্ত আমার বিবাহ হয় নাই।’

অবশ্য ঘ্যাঁঘো ও নাকেশ্বরীর শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয়েছে। এই বিয়ের আসরে ‘ভূশণ্ডীর মাঠ’-এর শিবু ও নৃত্যকালীর প্রেতলোকে বিবাহ বাসরের আগমনী শোনা যাচ্ছে। তবে সেখানে গণ্ডগোল দেখতে দেশি বিলেতি সব ভূত জড়ো হওয়ার বর্ণনা দিয়েছেন পরশুরাম। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে লুল্লু অবশ্য জানিয়ে দিয়েছে বিয়েতে বিদেশি ভূতকে ডাকা ধর্মবিরুদ্ধ হবে।

‘সমুদ্রের অপর পারে পদক্ষেপ করিলে আমরা জাতিকুলভ্রষ্ট হইব। আমাদের ধর্ম কিঞ্চিৎ কাঁচা।...সমুদ্রপারের বায়ু লাগিলেই আমাদের ধর্ম ফুস করিয়া গলিয়া যায়।... কেবল তাহা নহে, পরে আমাদের বাতাস যাঁহার গায়ে লাগিবে, দেবতাই হউন কি ভূত হউন, নর হউন কি বানর হউন, তিনিও জাতিভ্রষ্ট হইবেন। যার পক্ষে যেরূপ ব্যবস্থা, — দিবারাত্রি তাঁহাদিগকে পঞ্চামৃত খাইতে হইবে, কিংবা কল্মা পড়িতে হইবে, তবে তাঁহাদের ধর্মটা টায়ে টোয়ে বজায় থাকিবে।’ বিলেত যাবার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল লেখককে, আমাদের মনে পড়ে যায়।

ধর্মের নামে লোক ঠকানোর বেসাতির অসাধারণ চিত্র আছে ‘নয়নচাঁদের ব্যবসা’ গল্পে। এটিও বৈঠকী ধারার গল্প, ফরাসডাঙার গুলিখোরদের আড্ডায় নয়নচাঁদ তার ধনী হওয়ার ইতিহাস ফেঁদে বসেছে। কলকাতায় বসন্ত রোগ দেখা দিতে নয়ন ফিকিরটি বের করে।

‘শীতলা গড়া কিছুমাত্র কঠিন নয়। গোল করিয়া মাটির একটি চাবড়া করিলেই হইল। তাহার উপর উত্তমরূপে সিন্দুর মাখাইলাম। টানা টানা লম্বা লম্বা দুইটি চক্ষু করিলাম। পুরাতন রাঙতা দিয়া শীতলাটি

ছোট বড় বসন্তে ছাইয়া ফেলিলাম।' ফলকথা মূর্তিটি এমন হবে যে দেখলেই আতঙ্ক জাগে। সঙ্গে তেমন ভয় দেখানো, হাড় কাঁপিয়ে দেওয়া ছড়াও চাই। নয়নচাঁদের সে ব্যাপারেও পটুতা কম নয়। ত্রৈলোক্যনাথের এই কবিতাটি এক কথায় অসাধারণ, পরশুরামের 'দক্ষিণরায়' গল্পের ব্যাঘ্র-দেবতার মাহাত্ম্য মনে পড়ে। ক্ষুরধার কৌতুকে ভরপুর।

> 'শীতলা বলেন আমি যার ঘরে যাই।
> ছেলে বুড়ো অ্যান্ডা বাচ্চা টপ টপ খাই।
> চৌষট্টি হাজার এই বসন্তের দল।
> গৃহস্থের ঘরে গিয়া দেয় রসাতল।।
> বড় বসন্ত ছোট বসন্ত বসন্তের নাতি।
> কারো ঘরে নাহি রাখে বংশে দিতে বাতি।।'

ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে যম, তাঁর প্রধান সচিব চিত্রগুপ্ত এবং যমদূতরা বারবার দেখা দিয়েছেন। ইহলোকের কাজকর্মের বিচার করে তবেই তো স্বর্গ নরক নির্দিষ্ট হবে। ইহলোকে কোন ধরনের কাজ যমের সবিশেষ পছন্দ, কোনটি নয় — এই প্রসঙ্গেই লেখক বরাবর ধর্মধ্বজী কুসংস্কারাচ্ছন্ন রক্ষণশীল সমাজকে এক হাত নিয়েছেন। 'নয়নচাঁদের ব্যবসা' গল্পে একটি ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা একাদশীর দিন আঙট কলার পাতায় পরদিন ভাত খাবে ভেবেছিল। পাপটি নেহাত কম নয়। যম তার মাথায় মৃত্যুর পর ডাঙস মারতে হুকুম দেন। যদিও পরে বিধবার দাদার যুক্তির কাছে পরাস্ত হন। দাদার যুক্তি ছিল মানস করলেই যদি পাপ হয় তবে ভাল কাজ করার মানস করলেই পুণ্য হওয়া উচিত। পাপপুণ্যের ধর্মতন্ত্রী হিসেব নিয়ে কৌতুক করার প্রবণতা ছিল পরশুরামেরও। চিন্তাধারায় দুই লেখক অনেকটাই এক গোত্রের। 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পের গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়া স্মরণীয়।

৩

শ্যামলকুমার সেনগুপ্ত লক্ষ্য করেছিলেন 'ডমরু চরিত' এর সঙ্গে সিন্দবাদ কাহিনীর সাদৃশ্য আছে। উভয় ক্ষেত্রেই সাতটি গল্প রয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করে একটি মানুষের নানা বিচিত্র দুঃসাহসিক অবিশ্বাস্য কাণ্ডকারখানা বর্ণিত হয়েছে। উভয়ক্ষেত্রেই পূর্ব অভিজ্ঞতা বর্ণনার সূত্রে পরিবেশিত হচ্ছে গল্পগুলি। দৈবকৃপা পাওয়া এবং আপন পুরুষকারের দ্বারা জয়লাভ — দু'দিক দিয়েই সিন্দবাদ ও ডমরুর মিল পেয়েছেন তিনি। সাদৃশ্য যে রয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের গল্পকাঠামো ত্রৈলোক্যনাথের কথাসাহিত্যে একটি স্থায়ী প্রভাব। কিন্তু চরম একটি বৈসাদৃশ্যও রয়েছে দুজনের মধ্যে। বস্তুত সিন্দবাদ কাহিনীর ছাঁচটিকে বিদ্রূপের হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করেছেন ত্রৈলোক্যনাথ। সিন্দবাদ শৌর্যবীর্যপৌরুষে অসামান্য আর ডমরুধর শঠ, প্রবঞ্চক, ফন্দিবাজ — এক কথায় একটি ডার্ক ক্যারেকটার। 'ডমরু চরিত' এর প্রাণ হল শাণিত স্যাটায়ার আর সেখানেই কালিক দিক থেকে মধ্যবর্তী একটি বিখ্যাত ইংরেজি বইয়ের কথা আমাদের মনে পড়ে। এটি হল জোনাথান সুইফটের 'গালিভার্স ট্রাভেলস্' — সিন্দবাদ কাহিনীর কাঠামো ব্যবহার করে সুইফট অষ্টাদশ শতকের ইংল্যাণ্ডের রাজনীতি, ধর্ম, সমাজ, সার্বিকভাবে মানবস্বভাবের নানা দুর্বলতার প্রতি সুতীব্র ব্যঙ্গ বর্ষণ করেছিলেন। স্যাটায়ার তাঁর প্রতিরোধের অস্ত্র — এক হিসেবে 'ডমরু চরিত'ও তাই। নিতান্ত অল্প বয়স থেকে জীবনসংগ্রামে নামতে হয়েছিল ত্রৈলোক্যনাথকে। বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মানুষের শয়তানি ও স্বার্থপরতার নানা রূপ দেখেছেন। যার ফলে জীবন সম্বন্ধে একটি তিক্ততা তাঁর মনে চিরস্থায়ী ছিল। এই তিক্ততা আর পরিহাস রসিকতা মিলে তৈরি হয়েছিল তাঁর সুকৌশলী ব্যঙ্গনৈপুণ্য, বিষাদকৌতুকী শৈলী।

'ডমরু-চরিত'-এ বৈঠকী মেজাজ শিল্প-সমুৎকর্ষ ছুঁয়েছে। আড্ডাপ্রিয় বাঙালির কাছে চিরচেনা এই ছক। গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপ, হাটতলা, জমিদার বাবুর বৈঠকখানা, দোকানে হাজির খদ্দেরকুল, পুকুরঘাটে, নদীতীরে, কুয়োর পাড়ে, কলতলায় মেয়ে বউদের জটলা, শহরের রেস্টুরেন্ট, বা কফিহাউস, অথবা রোয়াক, গলির মোড় — সমাবেশ যেমনই হোক না কেন প্রধান বক্তাকে ঘিরে আগ্রহী শ্রোতাদের উপস্থিতিতে নানা ধরনের পরচর্চা, রসালো কেচ্ছার ঘাট ছুঁয়ে ছুঁয়ে চিরকাল জমাটি গল্প আসর বসিয়েছে। কলকাতা শহর গড়ে ওঠার আদিপর্ব থেকেই আড্ডার ঐতিহ্য বহমান — যা বাঙালির গ্রামীণ সংস্কৃতির উত্তরাধিকার। পরে আড্ডার চরিত্রে যুগোচিত নানা বদল এসেছে। 'ডমরু-চরিত'-এর আড্ডার মেজাজ অবশ্য গ্রামীণ। ডমরুধরের দুর্গোৎসব উপলক্ষে বন্ধুরা একত্র হয়েছেন এবং বক্তা হিসেবে ডমরু গল্প শুনিয়েছে। প্রথম ও ষষ্ঠ গল্পে ডমরুর গল্পের পটভূমিটি দেওয়া হয়েছে।

> 'ডমরুধরের বাস কলিকাতার দক্ষিণ, যে স্থানে অনেক কাটি-গঙ্গা আছে। প্রথম অবস্থায় ইনি দরিদ্র ছিলেন। নানা উপায় অবলম্বন করিয়া এক্ষণে ধনবান হইয়াছেন। এলোকেশী ইঁহার তৃতীয়পক্ষের স্ত্রী। ডমরুধর বৃদ্ধ, সুপুরুষ নহেন। তথাপি এলোকেশীর সর্বদাই সন্দেহ। গত বৎসর দুর্লভী বাগদিনী ডমরুধরকে ঝাঁটাপেটা করিয়াছিল। সেই উপলক্ষে এলোকেশীও তাঁহাকে উত্তম মধ্যম দিয়েছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্বে ডমরুধর সন্ন্যাসী-বিভ্রাটে পড়িয়াছিলেন। সেই অবধি ইনি দুর্গোৎসব করেন। সুন্দরবনে ডমরুধরের আবাদ আছে। প্রজাতিদের নিকট হইতে চাউল, ঘৃত, মধু, মৎস্য প্রভৃতি আদায় করেন। প্রতিমাটি গড়া হয়, কিন্তু পূজার উপকরণ — ''প্রায় সমস্তই কাটি-গঙ্গার জল।'' আজ পূজার পঞ্চমীর দিন, দালানে প্রতিমার পার্শ্বে বন্ধুগণের সহিত বসিয়া ডমরুধর গল্পগাছা করিতেছেন।'

বন্ধুদের মধ্যে আছেন শঙ্কর ঘোষ, লম্বোদর, আধকড়ি প্রমুখ। এঁদের মধ্যে লম্বোদর কিছু সন্দেহপরায়ণ, ডমরুর আজগুবি গল্প প্রসঙ্গে তিনি অবিশ্বাস প্রকাশ করে থাকেন। ডমরু অবশ্য সেই সন্দেহ তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়। ডমরুর প্রথম গল্পেই হুজুগপ্রিয় বাঙালিকে ত্রৈলোক্যনাথ একহাত নিয়েছেন। পাঠকের স্মরণ থাকবে হুতোম তাঁর নকশায় বাঙালির হুজুগের বিশদ বিবরণ দিয়ে বিদ্রূপ করেছিলেন। স্যাটায়ারের ধরণে হুতোম ও ত্রৈলোক্যনাথে মিল আছে। ডমরু একটি সন্ন্যাসীকে পালন পোষণ করে কিঞ্চিৎ লাভের মুখ দেখছিল। প্রণামী হিসেবে লোকেরা যা দিত তার অর্ধেক চুক্তি অনুযায়ী সে পাচ্ছিল।

> ''যাহাতে তাহার প্রসার প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি হয়, দেশের যত উজবুক যাহাতে তাহার গোঁড়া হয়, সেজন্য আমি চেষ্টা করিতে লাগিলাম। মনে মনে সংকল্প করলাম যে, দুগ্ধবতী গাভীর ন্যায় সন্ন্যাসীটিকে আমি পুষিয়া রাখিব। কিন্তু একটা হুজুগ লইয়া বাঙ্গালী অধিক দিন থাকিতে পারেনা। হুজুগ একটু পুরাতন হইলেই বাঙ্গালী পুনরায় নূতন হুজুগের সৃষ্টি করে। অথবা এই বঙ্গভূমির মাটির গুণে আপনা হইতেই নূতন হুজুগের উৎপত্তি হয়।... পাঁচগেছে গ্রামে রসিক মণ্ডলের সপ্তমবর্ষীয়া কন্যার স্কন্ধে মাকাল ঠাকুর অধিষ্ঠান হইলেন। রসিক মণ্ডল জাতিতে পোদ। মাকালঠাকুরের ভরে সেই কন্যা লোককে ঔষধ দিতে লাগিল। দেবদত্ত ঔষধের গুণে অন্ধের চক্ষু, বধিরের কর্ণ, পঙ্গুর পা হইতে লাগিল। বোবার কথা ফুটিতে লাগিল। কতকগুলি সুস্থ লোককে কানা, খোঁড়া, হাবা, কালা, জোরো, অম্বুলে সাজাইতে হয়, তা না করিলে এ কাজে পসার হয় না।''

হুজুগ এবং ভরপাওয়া দুটিকেই এখানে এক ঢিলে বিদ্ধ করা হয়েছে। এই গল্পে যমদূতেরা ভুল করে

ডমরুকে যমরাজার দরবারে হাজির করেছিল। ডমরুর সামনেই ছিল আর এক বিচারপ্রার্থী বৃন্দাবন গুঁই। লোকটি অতি ধার্মিক, চিত্রগুপ্তের বয়ান অনুসারে দয়ালু, সত্যবাদী, পরোপকারী। এই পরিচয় শুনেই যম চটে গিয়ে ইহলোকে মানুষের কর্তব্য, অকর্তব্য নির্দেশ করেছেন।

> ' ''চিত্রগুপ্ত! তোমাকে আমি বারবার বলিয়াছি যে, পৃথিবীতে গিয়া মানুষ কি কাজ করিয়াছে, কি কাজ না করিয়াছে তাহার আমি বিচার করি না। মানুষ কি খাইয়াছে, কি না খাইয়াছে তাহার আমি বিচার করি। ব্রহ্মহত্যা, গো-হত্যা, স্ত্রী-হত্যা, করিলে এখন মানুষের পাপ হয় না, অশাস্ত্রীয় খাদ্য খাইলে মানুষের পাপ হয়।'...''কেমন হে বাপু! কখনও বিলাতি বিস্কুট খাইয়াছিলে?" সে উত্তর করিল — ''আজ্ঞা না।"
>
> যম জিজ্ঞাসা করিলেন, — ''বিলাতি পানি? যাহা খুলিতে ফট করিয়া শব্দ হয়? যাহার জল বিজবিজ করে?... সত্য করিয়া বল, কোনরূপ অশাস্ত্রীয় খাদ্য ভক্ষণ করিয়াছিলে কি না?"
>
> সে ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর করিল, — ''আজ্ঞা একবার ভ্রমক্রমে একাদশীর দিন পুঁইশাক খাইয়া ফেলিয়াছিলাম।"
>
> যমের সর্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, — ''সর্বনাশ! করিয়াছ কি! একাদশীর দিন পুঁইশাক। ওরে! এই মুহূর্তে ইহাকে রৌরবে নরকে নিক্ষেপ কর। ইহার পূর্বপুরুষ, যাহারা স্বর্গে আছে, তাহাদিগকেও সেই নরকে নিক্ষেপ কর। পরে ইহার বংশধরগণের চৌদ্দপুরুষ পর্য্যন্তও সেই নরকে যাইবে।" '

খাদ্যাখাদ্য বিচারের অর্থহীন আড়ম্বর নিয়ে এর থেকে জোরালো ব্যঙ্গ বোধহয় বাংলা সাহিত্যে আর কেউ করেননি। এই গল্পেই স্বদেশি হিড়িকে নানাবিধ লোক ঠকানো ব্যবসার প্রসঙ্গ আছে। এ যুগের পঞ্জি স্কীমে টাকা রেখে সর্বস্ব খোওয়ানোর মতো ব্যাপার সে যুগেও ছিল না তা নয়। সন্ন্যাসীর খপ্পরে পড়ে ডমরুর অনেক টাকা চোট হয়েছিল। সেই সময়েই স্বদেশি হিড়িক বা হুজুগ শুরু হল। ডমরু এক স্বদেশি কোম্পানি খুলল, ছোকরা এক ক্যানভাসার রাখল। শত শত দীনদরিদ্র লোক তার বক্তৃতায় ভুলে স্ত্রীর গয়না, ঘটিবাটি বেচে শেয়ার কিনল। বাকিটুকু লম্বোদরের মুখে শোনা যাক, ''স্পষ্ট বলনা কেন যে, সমুদয় টাকাগুলি তুমি হাম করিয়াছ। তাহার পর, দেশশুদ্ধ লোক এখন মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছে।"

তৃতীয় গল্পেও স্বদেশি কোম্পানি প্রসঙ্গে বাঙালির ব্যবসা বুদ্ধি এবং চরিত্র সম্বন্ধে দুর্দান্ত কটাক্ষপাত করেছে ডমরুধর। দেবী দশভুজা নাকি তাকে স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে বর প্রার্থনা করতে বলেছিলেন। ডমরুর ইচ্ছে ছিল সুন্দরবনে তার আবাদে মৃগনাভি হরিণের চাষের জন্য স্বদেশি কোম্পানি খোলে। ভেড়ার পালের মতো বাংলার লোক যেন টাকা দেয় — এই বর সে প্রার্থনা করেছিল। দেবীর মনে যথেষ্ট সংশয় ছিল, তুষারাবৃত হিমাচলে কস্তুরী হরিণ বাস করে, সুন্দরবনে তার চাষ হবে কী করে। ডমরু কিন্তু নির্ভয়।

> 'আমি বলিলাম, ''যে কাজ সম্ভব, যে কাজে লাভ হইতে পারে, সে কাজে বাঙ্গালী বড় হস্তক্ষেপ করেনা। উদ্ভট বিষয়েই বাঙ্গালী টাকা প্রদান করে।"'

দ্বিতীয় গল্পে মোহর চুরি করার অপরাধে ডমরুর দ্বিতীয় পত্নীর পিতা প্রহ্লাদ সেন মহা বিরূপ হয়ে তার ঘরে আর কন্যা পাঠাবেন না ঠিক করে তা ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু মানবস্বভাব ডমরুর খুব ভালভাবেই জানা ছিল।

> 'যেমন করিয়া পারি, আমি ধনবান হইব, টাকা হইলে কেহ তখন জিজ্ঞাসা করেনা যে, অমুক কি করিয়া সম্পত্তিশালী হইয়াছে। জাল করিয়া হউক, চুরি করিয়া হউক, যেমন করিয়া লোক বড় মানুষ হউক না কেন, অমুকের টাকা আছে, এই কথা শুনিলেই ইতর-ভদ্র সকলেই গিয়া তাহার পদলেহন করে, সকলেই তাহার পায়ে তৈলমর্দন করে, রও একবার আমার টাকা

হউক, তখন দেখিব যে, তুমি বাছাধন আমার বাড়িতে ফ্যান চ্যাটিতে যাও কিনা।'

কোথায় শিখল ডমরু টাকা করার উপায়? কলকাতায় এসে ঘোষের কাপড়ের দোকানে সে কাজ করত, পাঁচ টাকা মাইনে আর খাওয়া। জলবৎ তরলং ডাল আর নিতান্ত পাতলা বেগুন, কুমড়ো ভাজা, কখনও পচা চিংড়ির মাথার ঝাল।

> 'তাহার পর একগাঁট তেঁতুল ট্যাঁকে করিয়া আমি ভাত খাইতে বসিতাম। তাহা দিয়া কোনরূপে ভাত উদরস্থ করিতাম। যাহা হউক, এই স্থানে যাহা আমি শিক্ষা পাইয়াছিলাম, পরে তাহাতে আমার বিশেষ উপকার হইয়াছিল। আমি বুঝিয়াছিলাম যে, টাকা উপার্জন করিলেই টাকা থাকেনা; টাকা খরচ না করলেই টাকা থাকে।'

এই ধরনের ডমরুধরীয় সুভাষিত গোটা বইটি জুড়েই ছড়ানো আছে। একজন মহাকৃপণ, ধূর্ত, অর্থলোভী, সুযোগ-সন্ধানী এবং তৎসহ প্রবঞ্চক অথচ বুদ্ধিমান, সাহসী, কার্যপটু ব্যক্তির চোখ দিয়ে জগ-দরশন করিয়েছেন গ্রন্থকার। কীভাবে ব্যবসায় সাফল্যলাভ করতে হয় সেটিও ঘোষের কাপড়ের দোকানে ডমরুর শেখা। দোকানে যে খদ্দের দাম নিয়ে হেঁচড়া হেঁচড়ি কচলাকচলি করতেন না, তাকে দোকানদারের নির্দেশে বিলক্ষণ ঠকানো হত।

> 'দোকানদারের রীতি এই। আলাপী লোকেরা আমাদিগকে বিশ্বাস করে, আলাপী লোককে ঠকাইতে দোকানদারের বিলক্ষণ সুবিধা হয়। বড়বাজারে বসিয়া প্রতিদিন হাজার হাজার মিথ্যা কথা বলিতাম; শত শত লোককে আমরা ঠকাইতাম। না ঠকাইলে আমাদের কাজ চলেনা।'

ত্রৈলোক্যনাথের কৌতুকে এক ধরনের আবেগ বর্জিত তীক্ষ্ণ, শুষ্ক বুদ্ধিদীপ্ত প্রাখর্য আছে যা পরে পরশুরাম ও সুকুমার রায়ের লেখায় পাব। কিন্তু ডমরুচরিতের সপ্তম গল্পে ক্রোধ ও অশ্রু চাপা থাকেনি। শুক্লাম্বর ঢাক একজন পেশাদার গুরু, তাঁর নয় বৎসরের বালবিধবা কন্যা কুন্তলা খুব জ্বরে ভুগছিল। বৈশাখ মাসের দারুণ তপ্ত দিন, রোগশয্যায় শুয়ে কুন্তলা বারবার জল চাইছিল। দুরন্ত তৃষ্ণায় তার বুক যেন ফেটে যাচ্ছিল। কিন্তু সেদিন একাদশী। বিধবা কন্যাকে জল দেওয়া অবিধেয়। পরামর্শের জন্য ডমরুকে ঢাকমশাই ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ডমরুর দানবিক পরামর্শে এই একবার পাঠকের মনে তীব্র ঘৃণার সঞ্চার হয়। হাসির তার চড়াতে চড়াতে অসঙ্গতি কান্নায় পৌঁছে গেছে। 'আমি বলিলাম, — "বাপ রে! জল কি দিতে পারা যায়? ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা। একাদশীর দিন জল খাইতে দিলে তাহার ধর্মটি একেবারে লোপ হইয়া যাইবে।" ডমরুর পরামর্শে ঢাক শুধু জল দিলেন না তা নয়, পাছে কন্যা জল চুরি করে খায় বা তার মা বা বোন কেউ দয়াপরবশ হয়ে জল দিয়ে ফেলে তাই কুন্তলাকে নীচের তলার এক ঘরে তালা বন্ধ করে রাখলেন।

> 'প্রাতঃকালে যখন তিনি ঘরের চাবি খুলিলেন, তখন সকলে দেখিল যে, বালিকা পিপাসায় হতজ্ঞান হইয়া ঘরের ভিজা মেঝের একধার হইতে অপর ধার পর্য্যন্ত সমস্ত রাত্রি বারবার চাটিয়াছে। অবশেষে অজ্ঞান হইয়া ঘরের এককোণে পড়িয়া আছে।...সেদিন দ্বাদশী। মাতা তাহার মুখে জল দিলেন। কিন্তু সে গিলিতে পারিলনা। দুই কশ দিয়া জল বাহিরে আসিয়া পড়িল। সে আর কথা কহিল না। শেষকালে একবারমাত্র বলিল, — "জল — জল।" এই কথা বলিয়া সে প্রাণত্যাগ করিল।'

পাপ কোনটি? একাদশীর দিন ধর্মের নামে রুগ্ন কন্যাকে জল না দেওয়ার মতো পাপ আর কী হতে পারে। কিন্তু দেশজুড়ে ধর্মে পরম মতির জন্য ঢাকমশায়ের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে অচিরেই শিষ্যসংখ্যা বেড়ে গেল। মেয়ের মৃত্যু তাঁকে তিলমাত্র বিচলিত করতে পারেনি বরং আনন্দিত করেছে কারণ 'বিধবা হইয়া চিরজীবন দুঃখে যাপন করা অপেক্ষা মরাই ভাল।' সতীর চিতায় চড়িয়ে কেন এদেশে বিধবাদের পুড়িয়ে

মারা হত যেন তার ইঙ্গিত দেন লেখক। ঢাকমশায়ের কপালে অবশ্য শান্তি ছিল না।

> ‘মৃত কন্যা তাহাকে অধিক দিন আনন্দ ভোগ করিতে দিল না। একদিন রাত্রি দুইপ্রহরের সময় সহসা “জল, জল! হা জল! হা জল!” এইরূপ ভীষণ চিৎকার করিয়া সে বাড়ীর চারিদিকে ছটফট করিয়া বেড়াইল।...ইহার চারিদিন পর ঢাকমহাশয়ের পুত্রটি মরিয়া গেল। এইবার ঢাকমহাশয় শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।’

কন্যা এবং পুত্র দুইয়ের মধ্যে আমাদের সমাজে পার্থক্য কতখানি, নির্লিপ্ত বিবৃতিতে তা এমন ভাবে জানানো হয়েছে, শিহরিত হতে হয়। কেন কুন্তলা প্রেতযোনি প্রাপ্ত হল তার শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যায় ডমরুধর তথাকথিত ‘পাপ’টি চিহ্নিত করেছে।

> ‘বিধবা হইয়া একাদশীর দিন ভিজা মেঝে চাটা পাপটি সামান্য নহে। গয়াতে হাজার পিণ্ড দিলেও ইহা ক্ষয় হয়না।’

অবশ্য স্যাটায়ারই ডমরুচরিতের প্রধান আকর্ষণ নয়, ব্যঙ্গের সঙ্গে ‘উদ্ভট’ রসের আশ্চর্য মিশ্রণেই এই বইয়ের আসল মজা। আবাদের মহাকায় কুমির একদিন ডমরুর চোখের সামনে সর্বাঙ্গে গয়নাপরা এক মহিলাকে গিলে ফেলল দেখে ডমরু পেট চিরে গয়না পাবার লোভে কুমিরটি ধরবার মতলব করে। হাটে যাওয়ার পথে এক ঝুড়ি বেগুন শুদ্ধ এক সাঁওতাল বুড়িকেও কুমির গিলে ফেলেছিল। জাহাজ বাঁধা কাছি এবং নোঙর দিয়ে এক অভুতপূর্ব বঁড়শি বানিয়ে পাঁচশো লোকের সাহায্যে কুমিরটি ধরেও কিন্তু ডমরু গয়না পেল না। করাত দিয়ে কুমিরের পেট কাটার পর সে চরম অবাস্তব একটি দৃশ্য দেখতে পেল। সেই মহিলার সব গয়না গায়ে পরে সাঁওতাল বুড়িটি ঝুড়ি উপুড় করে তার ওপর বসে বেগুন বিক্রি করছে।

> ‘লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন, — “কাহাকে সে বেগুন বেচিতেছিল? কুমিরের পেটের ভিতর সে খরিদ্দার পাইল কোথা?”
>
> বিরক্ত হইয়া ডমরুধর বলিলেন, — “তোমার এক কথা! কাহাকে সে বেগুন বেচিতেছিল, সে খোঁজ করিবার আমার সময় ছিল না। সমুদয় গহনাগুলি সে নিজের গায়ে পরিয়াছিল, তাহা দেখিয়াই আমার হাড় জ্বলিয়া গেল।”

এর সঙ্গে একমাত্র তুলনীয় হতে পারে বাঘের পেটে বসে পকেট থেকে কাগজ কলম বার করে ডমরুর আবাদের কর্মচারীকে চিঠি লেখা, সেই চিঠি যথাবিধি পেয়ে কর্মচারী কর্তৃক বাঘকে টারটার এমিটিক ওষুধ সহ ছাগলের টোপ দিয়ে বমি করিয়ে ডমরুকে উদ্ধার। এবারও লম্বোদর সংশয়ের খোঁচা দিতে ছাড়েননি, কিন্তু সেই সমস্যা ডমরু হেলায় সমাধান করেছে।

‘লম্বোদর বলিলেন, — “তা সব হইল। কিন্তু একটা কথা তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করি। ব্যাঘ্রের পেটের ভিতর হইতে তোমার কর্মচারীর নিকট সে চিঠি তুমি কি করিয়া পাঠাইলে?” কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত নীরব থাকিয়া ডমরুধর উত্তর করিলেন — ‘দেখ লম্বোদর! সকল কথার খোঁচ ধরিও না। এইমাত্র তোমাকে আমি বলিতে পারি যে, বাঘের পেটের ভিতর ডাকঘর নাই, সে স্থানে টিকিট বিক্রয় হয় না, সে স্থানে মানিঅর্ডার হয় না। তিরিক্ষি মেজাজের ডাকবাবু সেখানে বসিয়া নাই।’ প্রতি-আক্রমণই সেরা প্রতিরক্ষা প্রবাদটি এখানে সার্থক।

ভণ্ড দেশপ্রেমিকদের ওপর ত্রৈলোক্যনাথের বিপুল বিতৃষ্ণা ছিল। চতুর্থ গল্পে মহাকাশে কার্তিকের ময়ূর চড়ে ভ্রমণকালে ডমরুর সঙ্গে নভোনিবাসী পিং এর দেখা হয়েছিল। ‘বঙ্কুবাবুর বন্ধু’ গল্পে গ্রহান্তরের প্রাণীর নাম সত্যজিৎ রায় দিয়েছিলেন, ‘অ্যাং’। ত্রৈলোক্যনাথেরও অনুস্বরের প্রতি এই ব্যাপারে পক্ষপাত ছিল দেখা যাচ্ছে। পিং ডমরুকে অশ্বাণ্ড অর্থাৎ ঘোড়ার ডিমরূপী এক উদ্ভট লোক দর্শন করতে পাঠান। ব্রহ্মাণ্ডের ওপারে এটি নতুন আমদানি। পিং এর বয়ানে, ‘অল্প দিন হইল ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের নিকট

গিয়া যম আবেদন করিলেন যে, — 'বঙ্গদেশের বিটলে কপট স্বদেশভক্তগণ শীঘ্রই প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইবে। তাহাদের প্রেতকে আমার আলয়ে আমি স্থান দিতে পারিবনা। তাহাদের কুহকে পড়িলে আমি উৎসন্ন যাইব। ছেলেখেকো বক্তারাও শীঘ্র প্রেত হবে। তাহাদিগকে আমি স্থান দিতে পারিবনা। আমার আলয়ে আসিয়া তাহারা হয়তো কোম্পানী খুলিয়া বসিবে। তখন যমনীকে হাতের খাড়ু বেচিয়া শেয়ার কিনিতে হইবে। তাহার মহাপ্রভুরা এক কড়া কানাকড়িও উপুড় হস্ত করিবেন না। ইহাদের জন্য কোন ব্রহ্মাণ্ডে স্থান দিতে পারিব না।' যমের আবেদনে সাড়া দিয়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ভেবেচিন্তে ইন্দ্রের ঘোড়া উচ্চৈঃশ্রবাকে এক অণ্ড প্রসব করতে বললেন। বিশ্বসংসারের ওপারে এই ঘোড়ার ডিমের লোক — সেখানে বিটলে স্বদেশ ভক্ত, ছেলেখেকো বক্তা ও স্বদেশী প্রবঞ্চকদের প্রেত বাস করে।

দেশের হিতের জন্য যিনি গোটা জীবন চেষ্টা করেছেন, তাঁর কলমেই এই নির্মম বিদ্রূপ শোভা পায়। মেকি স্বদেশপ্রেমীদের ঢক্কানিনাদ ও অশ্বাণ্ডপ্রসব অবশ্য ত্রৈলোক্যনাথের প্রয়াণের শতবর্ষ পার করেও জাজ্বল্যমান।

৪

ত্রৈলোক্যনাথের শৈলীর একটি বৈশিষ্ট্য হল নেহাৎ সাদাসিধে ভঙ্গিতে আখ্যান শুরু করে তিনি এমন একটি মন্তব্য করেন — মানবসংসারের স্বার্থপর প্রকৃতিটি হঠাৎ অবারিত হয়ে যায়। শোনা যায় নিজের কন্যার দুর্দশাময় জীবনই তাঁর 'ময়না কোথায়' উপন্যাসের প্রেরণা। উপন্যাসের সূচনায় যাদব মুস্তাফি ও নরোত্তম মাশচটক দুটি ছেলের বিপরীত চরিত্রের বর্ণনা দিচ্ছেন লেখক। 'যাদব বলিষ্ঠ, নরোত্তম রুগ্ন ও দুর্বল। যাদব উদ্ধত স্বভাব বিশিষ্ট, অল্পেই রাগিয়া যায়; কিন্তু তৎক্ষণাৎ শীতল হয়। তাহার পর, আর সে কথা তাহার মনে থাকে না। নরোত্তম ধীর, সহজে রাগেনা; কাহারও উপর রাগ হইলে মনে মনে তাহা রাখিয়া দেয়, কখন তাহাকে ক্ষমা করে না, তাহার অনিষ্ট সাধনের নিমিত্ত সর্বদা ছিদ্র অন্বেষণ করে। যাদবের পেটে কথা থাকে না, মনে যাহা হয়, তৎক্ষণাৎ সে বলিয়া ফেলে। নরোত্তমের মনের কথা কেহ পায় না। নিজের ভাল হবে কি মন্দ হবে, যাদব সে চিন্তা কখনও করে না। নরোত্তম সর্বদাই নিজের মঙ্গলের চেষ্টা করে। যাদব কখনও হাতে একটি পয়সা রাখে না, হয় গরীব দুঃখীকে দিয়া ফেলে, না হয় খাবার কিনিয়া বন্ধুবান্ধবদের সহিত ভাগ করিয়া খায়। নরোত্তম কখনও একটি পয়সা খরচ করে না।'

এই পর্যন্ত পড়ে মনে হয় বিদ্যাসাগর মশাইয়ের বর্ণপরিচয়-এর গোপাল-রাখালের জীবনী পড়ছি। জানা কথা যাদব হল ভাল ছেলে এবং নরোত্তম মন্দ। ধাক্কাটা লাগে তারপর, 'ফলকথা, নরোত্তমের সুবুদ্ধি ও নম্র প্রকৃতির জন্য সকলেই তাহাকে প্রশংসা করে; যাদবের প্রশংসা কেহ করে না। পিতামাতারা আপনাদের পুত্রদিগকে বলেন, — "আহা! নরোত্তম কি সোনার ছেলে, দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। তোমরা তাহার মত হইও। যাদবের মত যেন হইও না।"' অভিভাবকদের সদ্‌বুদ্ধি, সন্তান সম্পর্কে আশা আকাঙ্ক্ষা গোপনে গোপনে কেমন স্বার্থপর ও কদর্য তা খুবই নিচু গলায় লেখক বলে ফেলেন। তাই পাঠকের মনে প্রতিক্রিয়া হয় তীব্র।

ত্রৈলোক্যনাথের শৈলীর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল অন্যায়কারীর বয়ানে ঘটনাকে দেখানো। অপরাধী মনে করে সে যথেষ্ট উচিত কাজ করছে, তার দোষ ধরা কোনোভাবেই উচিত নয়। সমস্ত দোষ নিপীড়িতের। অপরাধীর মনস্তত্ত্ব তিনি বেশ ভাল বুঝতেন। মাশচটক গৃহিণীর শাশুড়িসেবার বর্ণনাটি লক্ষ করা যাক, 'গুরুজনের নিন্দা করিতে নাই, কিন্তু আমার শাশুড়ির কথা যদি সব বলি, তাহা হইলে আর জ্ঞান থাকে না।...দেশে থাকিতে জলখাবারের জন্য প্রতিদিন বৈকালবেলা আমি বারোখানি করিয়া পরোটা করিতাম। চারিখানি কর্তার জন্য, চারিখানি আমার নিজের জন্য, আর চারিখানি অধরের জন্য। সন্ধ্যেবেলা আমাদের খাবার সময় বুড়ী করিত কি তা জান, বুড়ী সেই পরোটার পানে জুকুর জুকুর চাহিয়া থাকিত। ইচ্ছা যে,

তাহাকেও দুই একখানা আমরা দিই। কিন্তু তখন মাশ্চটক মহাশয়ের অবস্থা ভাল ছিল না। এত কোথা হইতে আসিবে, বুড়ীর সে বিবেচনা ছিল না। তোমরা কি বল! তার কি আর দুইটি মুড়ি খাইলে চলিত না! দাঁত ছিল না সত্য। তা কত লোক মাড়ি দিয়া যে পাহাড় পর্বত চিবায়, মাড়ি দিয়া লোহার কড়াই খাইয়া যে হজম করে! তোমরা কি বল! বুড়ীর দৃষ্টিতে সেই পরোটা আমাদের পেটে গিয়া গজ গজ করিত।'

অতঃপর গৃহিণীর প্ররোচনায় সুপুত্র মাশ্চটক লোলুপ দৃষ্টিতে খাদ্যবস্তুর দিকে চেয়ে থাকার জন্য নিজের গর্ভধারিণী জননীকে ধরে উত্তমমধ্যম দিলেন। বৃদ্ধা কাঁদতে লাগল। পুত্রবধূ অবাক হল, কারণ, 'তোমার বেটা! দশ মাস দশ দিন পেটে ধরিয়াছ। না হয় ঘা কতক মারিয়াছে। আদিখ্যেতা করিয়া তাতে আবার কান্না কেন বাছা?...দেখ মাশ্চটক মহাশয়! একদিন একটু শাসন করিলে চলিবে না। তোমার মাকে মাঝে মাঝে ঐরূপ শাসন করিতে হইবে। তবে অভ্যাস হইয়া যাইবে। তা না হইলে এক আধবার মারিলে ধরিলে ভ্যান ভ্যান করিয়া কাঁদিবে। কান্নার জ্বালায় বাড়ীতে আমি তিষ্ঠিতে পারিব না।...ভগবান মাথার উপর আছেন। আমি না হয় সহিলাম; কিন্তু তিনি সহিবেন কেন? তোমরা কি বল! আমি কাঁদিতে মানা করিয়াছিলাম। আমার কথা তিনি শুনিলেন না। কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষে তাঁহার চক্ষু দুইটি অন্ধ হইয়া গেল। তারপর একদিন সকালবেলা দেখি যে, বিছানায় কাঠ হইয়া পড়িয়া আছেন।'

বর্ণনাটি দোরোখা, আপাতদৃষ্টিতে মাশ্চটক গৃহিণীর হয়রানির আখ্যান, তলায় রয়েছে অসহায় বৃদ্ধাকে পুত্র, পুত্রবধূর অকথ্য নির্যাতনের বর্ণনা। যেমন সংবাদ কাগজপত্রে মাঝে মাঝেই বেরোয়। সেকালেও এমন ঘটনার অভাব ছিল না বোঝা যায়। সাজাদপুরে জলবেষ্টিত ছোট একটি টিপির ওপর তিনটি অথর্ব বৃদ্ধাকে বসে থাকতে দেখেছিলেন লেখক। আপনজনেরা যাদের মরবার জন্য ফেলে রেখে গিয়েছিল।

বস্তুত ত্রৈলোক্যনাথের রচনায় কৌতুকের সঙ্গে মানবস্বভাবের অন্ধকার প্রবণতাগুলি, লোভ, নির্দয়তা — এমনভাবে এসেছে যে তাঁকে ন্যাচারালিস্ট লেখকদের সমানধর্মা মনে হয়। মানবস্বভাবে শয়তানের বসবাস বিষয়ে জগদীশ গুপ্তের পূর্বসূরী মনে হয় তাঁকে। 'কঙ্কাবতী'তে ঠ্যাঙাড়ে গদাধর, কমল ভট্টাচার্য ও শিরোমণি মিলে কীভাবে গরদের কাপড় বেচতে আসা ব্রাহ্মণদের হত্যা করেছিল তার বর্ণনায় পৈশাচিকতা আর ভণ্ডামি পাঠকের শিরদাঁড়ায় শীতল স্পর্শ বইয়ে দেয়। বক্তা এখানে গদাধর,

> 'আমরা সেই দুইজনকে শেষ করিতেছি, এমন সময় তৃতীয় ব্রাহ্মণটি পলাইলেন। কমল তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলেন, আমিও আমার কাজটি সমাধা করিয়া তাঁহাদিগের পশ্চাৎ দৌড়িলাম। ব্রাহ্মণ গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলেন। শিরোমণি মহাশয়ের বাটীতে গিয়া — 'ব্রাহ্মণহত্যা হয়! ব্রাহ্মণের প্রাণ রক্ষা করুন', — এই বলিয়া আশ্রয় লইলেন। অতি স্নেহের সহিত শিরোমণি মহাশয় তাঁহাকে কোলে করিয়া লইলেন। শিরোমণি মহাশয় তাঁহাকে মধুর বচনে বলিলেন — "জীবন ক্ষণভঙ্গুর। পদ্মপত্রের উপর জলের ন্যায়। সে জীবনের জন্য এত কাতর কেন বাপু?" এই বলিয়া ব্রাহ্মণকে পাঁজা করিয়া বাটীর বাহিরে দিয়া শিরোমণি মহাশয় ঝনাৎ করিয়া বাটীর দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন।'

এরপর কমল কীভাবে ব্রাহ্মণকে মাঠের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল এবং সে ও ঠ্যাঙাড়ে গদাধর মিলে কীভাবে অসহায় লোকটিকে খুন করল সেই বর্ণনার বাস্তবতা পাঠকের হাড় কাঁপিয়ে দেয়। কিন্তু পাপের পরিণাম দেখানোর সময় ত্রৈলোক্যনাথ অনেকক্ষেত্রেই সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করে গেছেন। পাপীদের ভয়ংকর প্রায়শ্চিত্ত দেখানোর দিকে তাঁর এই ঝোঁক একদিকে যেমন তাঁর উপন্যাসগুলিতে বিশেষ করে নীতিকথার বাড়াবাড়ি এনেছে, তেমনি আখ্যানে এনেছে অতিসারল্য। প্রতিভাবান কথাসাহিত্যিকের এখানেই সীমাবদ্ধতা।

আসলে বাস্তবতা ত্রৈলোক্যনাথের প্রধান জোরের জায়গা নয়, তাঁর বিস্ময়কর আয়ুধ হল জাদুবাস্তবতা। উদ্ভট খেয়ালরসে তুলি ডুবিয়ে যা ঘটছে এবং যা ঘটতে পারে না তার ভেদরেখা মুছে ফেলে তিনি যখন ছবি আঁকেন তা অসামান্য হয়ে যায়। অনেক সময় এই শৈলী অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলার মায়াবাস্তব মনে পড়ায়। সম্প্রতি অবনীন্দ্রনাথের আরব্যরজনী সিরিজের একটি ছবি নতুন করে মুগ্ধ করল। মিনার আর গম্বুজওয়ালা প্রাসাদের আলো-আঁধারির মধ্যে এককোণে রয়েছে ‘কার এণ্ড টেগোর’ কোম্পানির সাইনবোর্ড, সেলাইতে ব্যস্ত দরজির সামনে রয়েছে একটি সিঙ্গার মেশিন। মধ্যযুগ আর আধুনিক যুগ মিলে মিশে একাকার হয়ে জোড়াসাঁকো বাড়িই যেন আরব্যরজনীর কুহকজগৎ। তবে তাঁর ছবিতে বিদ্রূপের তলোয়ারবাজি নেই, তা বরং রয়েছে গগনেন্দ্রনাথের তুলির টানে। এই দুই চিত্রশিল্পীর কৌশলের যুগলবন্দী যদি ভাষায় কল্পনা করা যায় মনে হয় ত্রৈলোক্যনাথের কথাসাহিত্যের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিল পাওয়া যাবে।

‘কঙ্কাবতী’ উপন্যাসে তনুরায় বংশজ ব্রাহ্মণ — সেই সুযোগে তিনি কন্যাদের বৃদ্ধ অযোগ্য পাত্রে বহু টাকা পণ নিয়ে বিক্রয় করতেন এবং অচিরেই তারা বিধবা হত। ছোট মেয়ে কঙ্কাবতীকে অতিবৃদ্ধ জনার্দন চৌধুরীর সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার সব বন্দোবস্তই তিনি করে ফেলেছিলেন। তনুরায়ের ছেলেটিও ঠিক বাপের মতো, মূর্খ এবং অর্থলোভী। সহমরণ প্রথা উঠে গেছে বলে তার মনে খেদ আছে। ‘তাহা থাকিলে ভগিনী দুইটি নিমিষের মধ্যেই স্বর্গে যাইতে পারিতেন। বসিয়া বসিয়া বাবার অন্নধ্বংস করিতেন না।’ গ্রামের পিতৃহীন সচ্চরিত্র বালক খেতুর সঙ্গে কঙ্কাবতীর আবাল্য সখ্য। খেতু কলকাতায় পড়াশোনা করে। সে নির্ভীক, সত্যবাদী। মায়ের জন্য একটি পাথরের শিব কিনেছিল বলে এক পাদ্রীসাহেব তাকে জাত তুলে গালাগালি দিয়েছিলেন। খেতু যে উত্তর দিয়েছে তাতে বোঝা যায় দুনিয়ার খবরাখবর সে ভালই রাখে। অহেতুক শ্বেতাঙ্গ প্রীতি বা গোঁড়া ধর্মান্ধতা কোনোটিই তার নেই।

> ‘‘আমেরিকার কালা-খৃষ্টানদিগের উপর আপনাদের যেরূপ ভ্রাতৃভাব, তা যখন লোকে শুনিবে, আর আফ্রিকার নিরস্ত্র কালা-আদমিদিগের প্রতি আপনাদের যেরূপ দয়ামায়া, তা যখন লোকে জানিবে, তখন এদেশের জনপ্রাণীও আর বাকি থাকিবে না, সব খৃষ্টান হইয়া যাইবে।’’

খেতুর সঙ্গে কঙ্কাবতীর শুভ পরিণয়ে উপন্যাস শেষ হবে, কিন্তু তার আগে কঙ্কাবতীর প্রচণ্ড জ্বরের সূত্র ধরে এই উপন্যাস কুহকের আশ্চর্য জগতে প্রবেশ করেছে। স্বপ্নে কঙ্কাবতী যখন নৌকা করে চলে যাচ্ছে, পাড়ে দাঁড়িয়ে ডাকছে তার দিদি, দাদা, মা, উত্তর-প্রত্যুত্তর চলছে যেন রূপকথা ও গীতিকার ভাষায়।

‘তখন কঙ্কাবতীর মা আসিয়া বলিলেন, —
    ‘কঙ্কাবতী লক্ষ্মী আমার, ঘরে ফিরে এস না?
    কাঁদিতেছে মায়ের প্রাণ, বিলম্ব আর ক’রোনা।
    ভাত হল কড় কড়, ব্যঞ্জন হইল বাসি।
    কঙ্কাবতী মা আমার সাতদিন উপবাসী।’
কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন, —
    ‘বড়ই পিপাসা মাতা না পারি সহিতে।
    তুষের আগুন সদা জ্বলিছে দেহেতে।
    এই আগুন নিবাইতে যাইতেছি মা।
    কঙ্কাবতীর নৌকাখানি এই হুথু যা।’

কিন্তু বাবা এসে যখন তার বিয়ের কথা বলে তীরে ডাকলেন, কঙ্কাবতী নৌকাকে বললেন ‘ডুবে যা’। এরপর অসম্ভবের ছন্দে কাহিনি চলেছে। বইটি প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ ‘সাধনা’ পত্রিকায় মোটামুটি অনুকূল সমালোচনা করেন। তিনি স্বীকার করেন ‘এইরূপ অদ্ভুত রূপকথা ভাল করিয়া লেখা বিশেষ ক্ষমতার কাজ।’ অনেক পরে ‘খাপছাড়া’, ‘সে’, ‘গল্পসল্প’-এ রবীন্দ্রনাথকে আমরা ননসেন্সের উদ্ভটরস সৃষ্টি করতে দেখেছি। ‘কঙ্কাবতী’র রবীন্দ্রকৃত সমালোচনা কিন্তু আজ আমাদের পুরোটা যথার্থ মনে হয় না।

‘উপাখ্যানের প্রথম অংশের বাস্তব ঘটনা এত দূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে যে, মধ্যে সহসা অসম্ভব রাজ্যে উত্তীর্ণ হইয়া পাঠকের বিরক্তি মিশ্রিত বিস্ময়ের উদ্রেক হয়।...পাঠকের মনে রীতিমত করুণা ও কৌতুহল উদ্রেক করিয়া দিয়া অসতর্কে তাহার সহিত এরূপ রূঢ় ব্যবহার করা সাহিত্য-শিষ্টাচারের বহির্ভূত।’ ‘অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড’-এর সঙ্গে তুলনা করে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন ‘অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড’-এ ‘বাস্তবের সঙ্গে অবাস্তবের এরূপ নিকট সংঘর্ষ নাই। এবং তাহা যথার্থ স্বপ্নের ন্যায় অসংলগ্ন, পরিবর্তনশীল ও অত্যন্ত আমোদজনক।’

কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে অবাস্তবের সংঘর্ষ লুইস ক্যারলের লেখাতেও রয়েছে। ভিক্টোরীয় ইংল্যাণ্ডের বাড়াবাড়ি নীতিপ্রিয়তা, বাতিকগ্রস্ত শোভনতা বা অতিপরিচ্ছন্ন শৃঙ্খলার বিপরীতে এক বিকল্প জগৎ তৈরি করেন ক্যারল। সে যুগের প্রচলিত জনপ্রিয় সব সুনীতিসঞ্চারিণী, শৃঙ্খলাজাগানিয়া, সদুদ্দেশ্যে ভরপুর শিশুপাঠ্য কবিতাগুলিকে উল্টেপাল্টে দেন। অ্যালিসের আখ্যানের শেষে বিচারশালার যে প্রহসন আছে তা কি বাস্তবের ভিন্ন রূপ নয়? ক্যারলের ননসেন্সে স্যাটায়ারের অংশ কতটুকু তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে কিন্তু শুধুই ‘আমোদজনক’ তাকে বলা যাবে না। উদ্ভটরসে কৌতুকের যে তরবারি ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছে তা ছোটদের নজরে পড়ার জন্য নয়, সে আঘাত বড়দেরই জন্য।

জাপানি প্রাচীন রূপকথায় আছে এক চিত্রকর বড় মন দিয়ে একটি অপূর্ব সুন্দরী নারীর ছবি এঁকেছিল। শিল্পী যখন বাড়িতে থাকত না, পট ছেড়ে মেয়েটি জীবন্ত হয়ে নেমে এসে গৃহস্থালির সব কাজ সুসম্পন্ন করে আবার পটে ফিরে যেত। টের পেয়ে শিল্পী একদিন মেয়েটিকে ধরে ফেলে। তারপর মধুরেণ সমাপয়েৎ। কঙ্কাবতীর ঝিনুকে লুকিয়ে থাকার গল্প অনেকটা সেইরকম। ব্যাঘ্ররূপী খেতুর কঙ্কাবতীকে বিয়ে করা — টুনটুনির বইয়ের বাঘবরকে মনে করায়। বাংলার লোকসংস্কৃতির অপূর্ব সমৃদ্ধ জগৎ থেকে কত বিলুপ্ত রূপকথা, কত ছড়া, কিংবদন্তি যে এই গ্রন্থে লেখক তুলে এনেছেন। তবু ‘কঙ্কাবতী’ রূপকথা বা উপকথা নয় — মায়াবাস্তবটি নির্মোকের মত নয়, বর্ণিল উত্তরীয়ের মতো আখ্যানের অঙ্গে অঙ্গে জড়ানো। মায়া ভেদ করে মাঝে মাঝেই তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ঝিলিক দেয়। স্কল ও স্কেলিটনের সঙ্গে খেতুর আলাপচারিটি একটু দেখা যাক, স্কল বলছে, — ‘‘আমরা কোম্পানী খুলিয়াছি। কোম্পানীর নাম রাখিয়াছি, ‘স্কল, স্কেলিটন এণ্ড কোং।’ ইংরেজী নাম রাখিয়াছি কেন, তা জান? তাহা হইলে পসার বাড়িবে, মান হইবে, লোকের মনে বিশ্বাস জন্মিবে। যদি নাম রাখিতাম, ‘খুলি, কঙ্কাল এবং কোম্পানী’ তাহা হইলে কেহই আমাদিগকে বিশ্বাস করিত না। সকলে মনে করিত, ইহারা জুয়াচোর। দেখিতে পাও না? যে যখন মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় ও চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েরা জুতা কি শরাপ কি হ্যাম বা শূকরের মাংসের দোকান করেন, তখন সে দোকানের নাম দেন ‘লংম্যান এণ্ড কোং’ অথবা ‘গুডম্যান এণ্ড কোং’। দেখিয়া শুনিয়া শতসহস্রবার ঠকিয়া দেশী লোককে আর কেহ বিশ্বাস করেনা। বরং ইংদ্রুজ পিংদ্রুজ দোকানীর কথা লোকে বিশ্বাস করে, তবু দেশী দোকানীর কথা লোকে বিশ্বাস করে না। আবার দেখ, বেদের কথা বল, শাস্ত্রের কথা বল, বিলাতী সাহেবরা যদি ভাল বলেন, তবেই বেদ পুরাণ ভাল হয়। দেশী পণ্ডিতদের কথা কেহ গ্রাহ্যও করে না।’’

‘হিশ ফিশ ড্যাম’ — এইসব বুকনিঝাড়া সাহেবায়িত ব্যাঙ মিস্টার গমিশ সে যুগের ইংরেজিয়ানাতে

অভ্যস্ত বাঙালির প্রতিনিধি। আবার প্রবাদের ‘ব্যাঙের আধুলি’ হারিয়ে গেছে বলে সে কাঁদতেও বসেছে। ‘হ য ব র ল’-এর ‘উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে’ বা ‘আবোল তাবোল’-এর ন্যাড়ার বেলতলাতে যাওয়া মনে পড়ে যায়। ত্রৈলোক্যনাথ নিজে উদারচরিত্র সাহেবদের অধীনে কাজ করেছেন কিন্তু ব্রিটিশ শাসকের শোষক চরিত্র সম্পর্কে তাঁর কোনোরকম মোহ ছিল না। কঙ্কাবতী যখন মশাদের দঙ্গলে গিয়ে পড়েছিল তখন মশাদের বক্তৃতায় দেশি বিদেশি সব ধরণের শোষকের স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে। ‘কলিকালে ভারতবাসীগণ চক্ষে ঠুলি দিয়া, হাত যোড় করিয়া, অন্ধকূপের ভিতর বসিয়া থাকিবে, আর পৃথিবীর যাবতীয় মশা আসিয়া তাহাদিগের রক্ত শোষণ করিবে।’ মশার রূপকে কাদের কথা বলা হয়েছে পাঠকের বুঝতে দেরি হয় না।

মৃত্যুর শতবর্ষ পরে ত্রৈলোক্যনাথের কথাসাহিত্য আজ পুনর্পাঠের দাবি জানাচ্ছে। তাঁর উত্তরাধিকার এখন সুদূরপ্রসারী। নবারুণ ভট্টাচার্যের ‘হারবার্ট’-এর ভূতের দল বা ‘কাঙাল মালসাট’-এর ফ্যাতাড়ুরা ত্রৈলোক্যনাথের সামাজিক, রাজনৈতিক স্যাটায়ারের তীব্রতাকে আত্মস্থ করে প্রখরতর মাত্রা যোগ করেছে — এই কথা বললে কি বেশি বলা হয়ে যাবে?

উল্লেখপঞ্জি :

ত্রৈলোক্য রচনা সমগ্র, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, গ্রন্থমেলা, প্রকাশ ১৯৭৩, ১৯৭৪।
প্রকাশকাল অনুযায়ী ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য :
কঙ্কাবতী ১৮৯২
ভূত ও মানুষ ১৮৯৭
ফোকলা দিগম্বর ১৯০০
মুক্তামালা ১৯০১
ময়না কোথায় ১৯০৪
মজার গল্প ১৯০৪
পাপের পরিণাম ১৯০৮
ডমরু-চরিত ১৯২৩

গোপা দত্তভৌমিক : প্রাবন্ধিক ও গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য।